আষাঢ়ে স্বপ্ন

অথবা

জানোয়ারের মেলা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ঃ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

আষাঢ়ে স্বপ্ন

অথবা

জানোয়ারের মেলা

সূচীপত্র

আষাঢ়ে স্বপ্ন

অথবা

জানোয়ারের মেলা

তখন পূজার ছুটি। আমি আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছি। ক্লান্তিবোধ হওয়াতে সকাল সকাল শুইয়া পড়িলাম। যেমন শোওয়া, অমনি ঘুম। এ অভ্যাসটি আমার ছেলেবেলা হইতে! কিন্তু সে কথা যাক—আমি তো ঘুমাইয়া পড়িলাম। খানিক পরে মনে হইল, আমি যেন আলিপুরে গিয়াছি। সেটা যেন সিংহ, বাঘ আর ভালুকের দেশ। চারিদিকেই জানোয়ারের ঘর-বাড়ি, জানোয়ারের পথ-ঘাট, জানোয়ারের হাট-বাজার। জানোয়ারগুলো যেন সকলেই স্বাধীন। আবার সম্প্রতি যেন তাহারা কিছু অধিক মাত্রায় শান্ত-শিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে! সিংহ-বাঘেরও যেন রক্ত-মাংসে আর তেমন রুচি নাই! তাই, তাহাদের কাহাকেও আর আটকাইয়া রাখিবার দরকার হয় না।

যাহা হউক, তাহাদের নিকট হইতে একটু দূরে থাকা ভাল মনে করিয়া আমি একটা বড় রাস্তা ধরিলাম। কিছু দূর গিয়া, প্রথম পরিচয় হইল একটা উল্লুকের সঙ্গে। তাহার নাম 'চতুর্ভুজ'। চতুর্ভুজ বেশ ভালমানুষ! দুই দণ্ডেই আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়া লইল। আমি বলিলাম, 'তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি; এখানে দেখবার মত কিছু আছে কি? চতুর্ভুজ বলিল, দেখবার অনেক জিনিষ আছে। বিশেষ, কাল আমাদের রাজার ছেলের বিয়ে। তাই কয়েক দিন থেকে খুব ধুমধাম আমোদ-আহ্লাদ চলছে। চল, তোমাকে কিছু কিছু দেখিয়ে আনি।'

আমরা দুইজনে বাহির হইলাম। রাস্তার মোড় ফিরিয়াই, সম্মুখে খুব বড় প্রকাণ্ড বাড়ি দেখিতে পাইলাম। চতুর্ভুজ বলিল, 'ঐ আমাদের রাজার বাড়ি।' বাড়ির সম্মুখে গিয়া দেখি, মস্ত ফটক! বন্দুকে সঙিন চড়াইয়া 'পেঙ্গুইন' সাহেব পাহারা দিতেছে। বন্দুক দেখিয়া আমার বুকটা গুর গুর করিয়া উঠিল! আর মুখের চেহারাটাও, বোধ করি, কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছিল। তাহা না হইলে চতুর্ভুজ আমার মনের ভাব বুঝিল কেমন করিয়া! আমাকে সাহস দিবার জন্য সে বলিল, ভয় কি! এ তো আর মানুষের দেশ নয় যে, এখুনি বন্দুক উঠিয়ে গুলি ছুঁড়বে। এটা জানোয়ারের মুল্লুক! এখানে কাউকে গুলি করবার হুকুম নেই।'

চতুর্ভুজের কথা শুনিয়া আমার একটু সাহস বাড়িল। বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজ-বাড়ি দেখিতে লাগিলাম। রাজবাড়ি অতি পরিপাটি। চারিদিকে মোটা মোটা থাম; থামের উপর বড় বড় খিলান! খিলানে ও কার্নিসে নানা রকম কাজ-করা। অনেকটা সেকেলে রাজরাজড়াদের বাড়ির মত। সিঁড়ির দুইধারে নানা রকম ফুল ও

পাতাবাহারের গাছ। সম্মুখে ফুলবাগান। আমরা এদিক সেদিক চাহিতে দেখিলাম, ঘরের ভিতর প্রকাণ্ড এক সিংহ বসিয়া রহিয়াছে, আর একটা ভালুক তাহার চুল ছাঁটিয়া দিতেছে! আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ও কে?'

চতুর্ভুজ বলিল, 'উনিই আমাদের রাজা। রাজামশাই এখন ক্ষৌরি হচ্ছেন। রাজার সঙ্গে তুমি দেখা করবে?' আমি বলিলাম, 'না ভাই, তোমাদের রাজার সুমুখে যেতে আমার সাহস হচ্ছে না। চল,-অন্য রাস্তা ধরি।' চতুর্ভুজ একটু হাসিয়া বলিল, 'তমি এত ভীরু!'

আবার দুইজনে চলিতে লাগিলাম। রাজবাড়ির দক্ষিণ দিক দিয়া একটা সরু গলি গিয়াছে। সেই গলি ধরিয়া কিছু দূর গিয়াই একখানি খোলার বাড়ি দেখিতে পাইলাম; সেই বাড়ির ভিতর হইতে একটা যেন নাকি সুরের গোঙানি শব্দ আমার কানে আসিতে লাগিল। চতুর্ভুজ বলিল, 'এটা আমাদের ছেলেদের পাঠশালা। এক বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত এখানে গুরুগিরি করেন!' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ গোঙানিটা কিসের?' চতুর্ভুজ তাড়াতাড়ি দেখিয়া আসিয়া বলিল, 'ও কিছুই নয়। এক ছোকরা দু'য়ে দু'য়ে যোগ করে পাঁচ লিখেছে, তাই গুরুমশাই রাগ করে তার কান ধরে পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে দেবার মতলব করেছেন, আর ছেলেটা কাঁদছে।' আমি বলিলাম, 'এই সামান্য অপরাধে এত কঠিন শাস্তি!' চতুর্ভুজ একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, অপরাধটা সামান্য হল কিসে? দু'য়ে দু'য়ে কত হয়, এ যে না বলতে পারে, তাকে পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত।' আমি বলিলাম, 'ভায়া, তুমি তো আর মানুষের ছেলেদের পাঠশালা দেখনি, তাই অমন কথা বলছ! মানুষের ছেলে হলে হয় তো বলত—

দুয়ের পিঠে দুই
বিছনা পেতে শুই।'

—'একবার একটি ছেলেকে "জল" বানান করতে বলা হয়েছিল। সে অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে, ভয়ে এক গা ঘেমে শেষে বললে "ফু" আর "স"! আর একটি ছেলের হাতে পাঁচটা সন্দেশ দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "এর থেকে যদি কেউ একটা খায়, তবে আর ক'টা থাক্‌বে!" সে তো প্রশ্ন শুনে কেঁদেই আকুল। বাপরে সে কি কান্না! কেবল কাঁদে আর বলে, "আমি একটাও দেব না"!

আমাদের খোকাবাবুদের কথা শুনিয়া চতুর্ভুজ বলিল, 'সত্যি, এমন সব ছেলে নিয়ে তোমরা ঘরকন্না কর! তা মানুষের ছেলে, কত আর ভাল হবে! এ রকম ছেলে কিন্তু আমাদের এই জানোয়ারের দেশে একদিনও টিকতে পারত না।'

পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া গল্প করিতে করিতে আমরা একটা ছোট নদীর ধারে উপস্থিত হইলাম। ঘাটে দেখিলাম, একখানা নৌকা বাঁধা। ওপারে যাইবার জন্য বিস্তর জানোয়ার জড় হইয়াছে। কিন্তু খেয়া-মাঝি কুমির আজ গরহাজির। আফিসের বেলা হইয়া যাইতেছে, তবুও মাঝির দেখা-সাক্ষাৎ নাই। খোঁজ করিতে করিতে শুনিতে পাওয়া গেল, বেচারার একটা দাঁতে বড় ব্যথা হইয়াছে, তাই সে "লেজমোটা" নামে এক নামজাদা ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছে। দাঁতটা নাকি তুলিয়া ফেলা নিতান্তই দরকার।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানেও আবার ডাক্তার আছে নাকি?' চতুর্ভুজ বলিল, 'ডাক্তার? বড় যে সে ডাক্তার নয়! এমন দু'চার জন মানুষের দেশে থাকলে, তোমরা প্রাণের ভয়ে সর্বদা এত অস্থির হয়ে বেড়াতে না!' আমি বলিলাম, 'সত্যি! তবে তো তোমরা বেশ সুখেই আছে। আচ্ছ, এখানে কোন্ কোন্ অসুখ বেশী?' চতুর্ভুজ বলিল, 'জ্বর-জাড়ি বড় একটা এখানে নেই। লেজ-ছেঁড়া রোগই এখানকার প্রধান রোগ। এমন দিন প্রায় যায় না, যে একজন না একজনের লেজ না ছেঁড়ে। তা ডাক্তারও তেমন সরেস! তার ওষুধের গুণে বোঁচা লেজ গজিয়ে উঠতে বোধ হয় এক মুহূর্তও সময় লাগে না! আবার যদি তিনি সেই ছেঁড়া-লেজ-টুকুর কাটামুখে এক ফোঁটা ওষুধ দেন, অমনি দেখতে দেখতে তা থেকে একটা আস্ত নতুন জানোয়ার গজিয়ে ওঠে! ব্যাপারখানা কি, একবার ভেবে দেখ। চার-পাঁচ দিনের কথা,—একটা শেয়ালের লেজ ছিঁড়ে গিয়েছিল। সে সেই লেজটুকু মুখে করে নিয়ে তখনি ডাক্তারের কাছে ছুটে গেল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তার বোঁচা লেজে এক ফোঁটা ডাক্তারি ওষুধ

বিদ্যাদিগগজ গুরু

পড়বামাত্র একটা নতুন লেজ বার হল ! আর সেই ছেঁড়া টুকরাতে এক ফোঁটা ওষুধ দিতে তা থেকে একটা নতুন শেয়াল গজিয়ে উঠল ! তারপর ডাক্তারকে সেলাম করে দুই শেয়ালে গল্প করতে করতে বাড়ি চলে গেল।'

চতুর্ভুজের গল্প শেষ হইতে না হইতেই নিকটে একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। চতুর্ভুজ বলিল. 'ভয় কি ? মানুষের মত এমন ভীরু আমি আর দেখি নি !' আমি মুখখানা একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিলাম, 'না, ভয় আর কিসের ? তবে কি না ভায়া, মানুষের প্রাণের দামটা বড় বেশী ; তাই একটু সাবধানে থাকতে হয়।' এই সময় আবার বন্দুকের আওয়াজ হইল। আমরা দেখিলাম, রাস্তার একপাশে দুইজন শিকারি বন্দুক হাতে করিয়া বসিয়া আছে। চতুর্ভুজ বলিল, ঐ দু'জন এখানকার গোরাপল্টন। ওদের সঙ্গে একটা নেউল দেখছ ? ওটাই ওদের কুকুর ! ওরা তেমন ভাল শিকারি নয়। আমাদের এই দেশে এমন সব শিকারি আছে যে, তাদের কথা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। আমার নিজের শিকারের একটা গল্প বলি, শোন। একবার শিকারে বার হয়ে আমি একটা রাঙা হরিণ দেখতে পাই। তার সর্বাঙ্গ ঠিক যেন মখমলে ঢাকা ! এমন সুন্দর হরিণ দেখলে চামড়াখানির ওপর কার না লোভ জন্মে ? কি উপায়ে ওটা আস্ত পাওয়া যায়, তাই ভাবতে লাগলাম। যদি গুলি করে হরিণটি মারি, তা হলে তো চামড়ার দফা রফা ! শেষে অনেক ভেবে চিন্তে এক উপায় ঠিক করলুম। হরিণ খুব মোটা একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি পকেট থেকে একটা পেরেক বার করে বন্দুকে পুরে, তার লেজে গুলি করলাম। আমার লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ ! পেরেক ঠিক হরিণের লেজ ফুড়ে গাছে বিঁধে গেল। অনেক টানাটানিতেও সে পালাতে পারল না। তখন আমি একখানা ধারাল ছুরি দিয়ে তার নাকের মাঝামাঝি খানিকটা চিরে দিলাম, আর একগাছা বেত নিয়ে খুব জোরে তাকে মারতে লাগলাম। মারের চোটে ছটফট করতে করতে বেচারা হরিণ সেই চেরা নাকের ফাঁক দিয়ে বার হয়ে
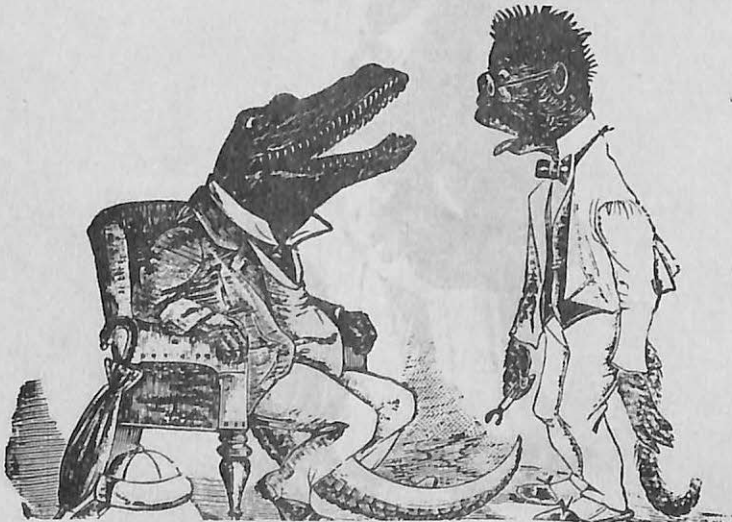
কুমির ও লেজমোটা ডাক্তার

গোরাপল্টন শেয়াল

পুলিশ সার্জেন্ট

পালিয়ে গেল ! আস্ত চামডাখানা নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম।' চতুর্ভুজের কথা শুনিয়া আমি ত অবাক ! অনেক শিকারি দেখিয়াছি, কিন্তু এমন আশ্চর্য শিকারের কথা জন্মেও শুনি নাই। ধন্য জানোয়ারের দেশ !

ইহার পর আমরা নদীর ধার হইতে ফিরিলাম। কিছু দূর আসিয়া সম্মুখে হ্যাট-কোট পরা এক সাহেব দেখিলাম। তাহার সঙ্গে দুইটি ছেলে। জানোয়ারের রাজ্যে সাহেব দেখিয়া প্রথমটা আমার আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কাছে আসিলে দেখিলাম, সে সাহেব নহে, একটা 'বুলডগ' সাহেবের পোশাক পরিয়া সাহেব সাজিয়াছে। আমাদের খুব কাছাকাছি হইলে, কুকুর-সাহেব ইসারা করিয়া চতুর্ভুজকে তাহার কাছে ডাকিল। তার পর দুইজনের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলিল। কি কথা হইল জানি না, কিন্তু কথাগুলা যে আমাকেই লক্ষ্য করিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। কারণ, কথা বলিতে বলিতে সাহেব কেবলই আমার দিকে তাকাইতেছিল। যাহা হউক, সে চলিয়া গেলে, চতুর্ভুজ আমার কাছে আসিয়া বলিল, 'লোকটা কে, জান ? এখানকার পুলিস-সার্জেন্ট। এই দেশে কোন নতুন লোক এলে, ওকেই তার খোঁজ-খবর রাখতে হয়। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

আমি বলিলাম, 'তা তুমি কি বললে ?' চতুর্ভুজ বলিল, 'তোমার পরিচয় দিলাম। তোমার মনে কোন ফন্দি-টন্দি নেই। কেবল জানোয়ারের দেশ দেখাই তোমার উদ্দেশ্য শুনে সাহেব আর কিছুই বলল না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'নতুন লোক দেখলেই তার খোঁজখবর রাখা কি এখানকার রীতি ?'

চতুর্ভুজ বলিল, 'তা নয় তো কি ? এ কি মানুষের দেশ পেয়ছ যে, চোর-ডাকাত, ভদ্র-ইতর—সব এক সঙ্গে বাস করবে ?'

আমি আর কিছু না বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। ইহার পর গলির মোড় ফিরিয়া, আমরা আবার রাজবাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু, এ কি ব্যাপার ! একটু আগে যে স্থান বেশ নিরিবিলি দেখিয়া গিয়াছি, এখন দেখি, সেখানে লোকে লোকারণ্য—অর্থাৎ জানোয়ারে জানোয়ারারণ্য !

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজ এখানে কিছু আছে নাকি ?'

চতুর্ভুজ বলিল, 'বাঃ, তোমাকে তো আগেই বলেছি, রাজার ছেলের বিয়ের জন্যে কয়েকদিন থেকে খুব ধুমধাম চলছে।

পশুরাজের আগমন

সিংহদের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যাটের কপাল বড় মন্দ, প্রত্যেকে ২।৩টি মাত্র 'রান' করিয়াই 'বোল্ড আউট' হইল। তৃতীয় ও সপ্তম ব্যাটের খেলা আবার বেশ জমিয়া গেল। তৃতীয় ব্যাট রানের সংখ্যা ২০৩ না করিয়া ছাড়িল না। বাকি কয়েকজনও পাকা খেলোয়াড় ছিল। সিংহদের পক্ষে 'রান' হইল—৩৯০ ; সুতরাং সিংহেরাই জিতিল।

মানুষের ক্রিকেট ম্যাচ দেখিয়াছি, খেলিতে খেলিতে কেহ খুব বাহাদুরি দেখাইতে পারিলে, সকলে হাততালি দিয়া তাহাকে উৎসাহ দিয়া থাকে। কিন্তু এই জানোয়ারের ক্রিকেট খেলাতে উৎসাহ দিবার রীতি অতি ভয়ানক। এক একজন 'রান' করিতে থাকে, আর হাজার হাজার সিংহ, বাঘ, গণ্ডার, ভালুক, কুকুর, বিড়াল, শেয়াল, গাধা উৎসাহে একসঙ্গে গলা ছাড়িয়া চ্যাঁচাইয়া উঠে। বাপরে, সে যে কি সাংঘাতিক আওয়াজ, তাহা কি বলিব। ভয়ে গা-টা যেন ছম-ছম করিয়া উঠে ! আর, সে কি একবার ? যতবার 'রান'—ততবারই সেই আওয়াজ ! সিংহের পক্ষে জয় হওয়াতে, পশুরাজের ভারি আনন্দ। তিনি লেজ নাড়া দিয়া মনের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর ফুটবল-ম্যাচ। সিংহ, বাঘ, ভালুক হাতি, জিরাফ এবং আরো কতকগুলাতে মিলিয়া দুই দলে ফুটবল খেলিতে লাগিল। দুই দলই সমান। অনেকক্ষণ পর্যন্ত লুটাপুটি হুড়াহুড়ি চলিল ; কোন পক্ষই জিতিতে পারিল না। ভালুকেরা ক্রিকেট-ম্যাচে হারিয়া খুব অপমানিত হইয়াছিল। পাছে আবার ফুটবল-ম্যাচে হারে, এই ভয়ে তাহারা কোমর বাঁধিয়া খুব উৎসাহের সহিত খেলিতে লাগিল। একে তাহারা পাকা খেলোয়াড়, তাহার উপর আবার প্রাণপণ করিয়া লাগিয়াছে, কাজেই বিপক্ষেরা দমিয়া গেল। উঠাউঠি দুই 'গোল' দিয়া ভালুকেরা ফুটবল ম্যাচ জিতিল। ভালুকদের জিত হওয়াতে, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা এমন বিকটস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল যে,

সিংহ ও ভালুকের ক্রিকেট

চলছে। চল, মেলার ভেতর গিয়ে বসি।'

মেলার মধ্যে একটা জায়গা বাছিয়া আমরা বসিয়া পড়িলাম। কিছু পরে হাতির পিছে চড়িয়া স্বয়ং রাজা মহাশয় উপস্থিত। চতুর্ভুজ আমরা গা টিপিয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'রাজার মাথায় কে ছাতি ধরে রয়েছে, জান ? ও আমার জ্ঞাতি ভাই ! দেখলে, আমাদের কত সম্মান ?' অহঙ্কারে তখন চতুর্ভুজের নাক তিনগুণ ফুলিয়া উঠিয়াছে ! লেজ থাকিলে, বোধ করি, তাহাও ফুলিয়া 'কলার গাছ' হইয়া উঠিত।

আমি বলিলাম, 'তা তো বটেই ! বন-গাঁয়ে শেয়াল রাজা ! জানোয়ারের রাজ্যেও যদি তোমাদের সম্মান না হয়, তবে আর হবে কোথায় ?'

আমার মুখের কথা শেষ না হইতেই, ছোট-বড় দুইটা ভালুক পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে নাচিতে মেলার মধ্যে প্রবেশ করিল। এইটাই প্রথম খেলা। আহা, সে কি রগড়ের নাচ ! মানুষের হাতেও ভালুক-নাচ দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সরেস নাচ আর হয় না ! দু'জনে ভঙ্গি করিয়া নাচে আর সুর করিয়া গান গায় ! ভালুকের ভাষার সে গানটা আমি বুঝিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু সকলেই 'বাহবা' করিতে লাগিল।

ইহার পর সিংহ আর ভালুকের ক্রিকেট ম্যাচ। দুই দলই সমান। বাছা বাছা এগারো জন সিংহ আর এগারো জন ভালুক। প্রথমে ভালুকেরা 'ব্যাট' ধরিল এগারো জন সিংহ 'ফিল্ড' করিতে লাগিল। কিন্তু 'ফিল্ড' আর করিবে কি, ভালুকের একটা 'হিট' বলটাকে একেবারে 'বাউণ্ডারি' পার করিয়া দেয় আর 'রান' বাড়িতে থাকে। প্রথম দু'জনে এমন খেলিল যে, দ্বিতীয় ব্যাট 'আউট' হইবার পূর্বেই ভালুকদের ৭৯ 'রান' হইল ! ইহার পর তৃতীয় ব্যাট আসিল। সে-ও বড় কম নয়। যদিও সে অল্পক্ষণ পরেই 'কট-আউট' হইল, তবুও তাহার পূর্বে ২৩টা 'রান' করিয়া লইতে ছাড়ে নাই ! ক্রমে ক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ প্রভৃতি সমুদয় ব্যাট উৎসাহে 'রান' করিয়া 'আউট' হইয়া গেল। প্রথম ব্যাট 'নট আউট' রহিল। ভালুকদের পক্ষে 'রান' হইল—৩৭৫।

ইহার পর সিংহেরা ব্যাট ধরিল। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাট তেমন সুবিধা করিতে পারিল না, কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় ব্যাট এমন জোরে বলটাকে সাঁটাইতে লাগিল যে, প্রথম ব্যাট 'আউট' হইবার পূর্বে সিংহদের 'রান' হইল ১০৬।

সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে কাহার সাধ্য ! তাহারা ধেই ধেই করিয়া নাচে আর অনেকগুলাতে মিলিয়া 'গাঁক' 'গাঁক' করিয়া একসঙ্গে চ্যাচাইতে থাকে ! সে চ্যাচানি আর থামে না ! শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, রাজা হুঙ্কার ছাড়িতে বাধ্য হইলেন ! তখন সব একেবারে চুপ।

ফুটবলের পর 'টাগ-অফ-ওয়ার'। এক পক্ষে হাতি, সিংহ, চিতাবাঘ ; অপর পক্ষে মহিষ, ভালুক, বানর প্রভৃতি। ক্রিকেট, ফুটবলের পর টাগ-অফ-ওয়ার ভাল লাগিবে কি না,—ভাবিতেছিলাম। কিন্তু শেষে বুঝিলাম, এই খেলাটাই সব চেয়ে সেরা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুই দলে প্রাণপণে দড়ি টানাটানি করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ

কাহাকেও হটাইতে পারিল না। টানাটানিতে হাতির উৎসাহ সব চেয়ে বেশী ! তাহার ইচ্ছা, ভালুকের দলটাকে একেবারে মুখ থুবড়িয়া আছাড় দিবে। সেই জন্য এমন জোরে টান দিতে লাগিল যে, ভালুকদের ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া গেল। সবাই ভাবিল, আর দুই-এক মিনিট পরেই ভালুকের দলকে চিৎপাত হইতে হইবে। ঐ—ঐ বুঝি গেল ! কিন্তু এ কি, বুড়ো-মদ্দ হাতিটাই কি না শেষে পা পিছলিয়া দড়াম ! আহাম্মক হাতির দোষেই অমন পাকা খেলাটি মাটি হইল ! রাগে, দুঃখে, অপমানে সিংহ মাথা নিচু করিয়া রহিল। ভালুকের দল আবার উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু এবারকার চ্যাচানি অনেকটা ভদ্র রকমের।

টাগ-অফ-ওয়ারের পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর কিছু বাকি আছে কি ?' চতুর্ভুজ বলিল, 'খেলা শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু এবার আমাদের জাতীয়-সঙ্গীত আরম্ভ হবে।'

জানোয়ারের আবার জাতীয় সঙ্গীত ! কথাটা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। কিন্তু সে হাসি বেশীক্ষণের জন্য নহে—
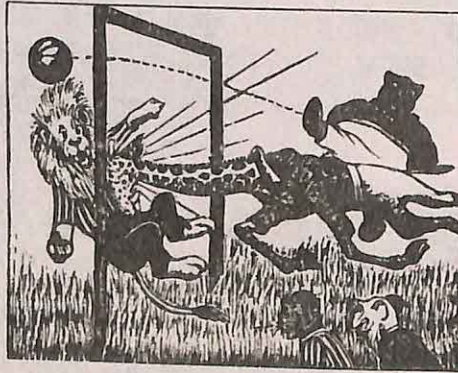
সামনে এসে দাঁড়ায়, হেন
শক্তি আছে কার ?
এক্কেবারে ঘাড়টি ভেঙে
রক্ত শুষি তার !

গানের এই প্রথম চার লাইন শুনিয়াই আমার তো চক্ষুস্থির ! মাথাটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল ! কি জানি, আমাকে দেখিয়া যদি কাহারও আবার রক্ত শুষিবার ইচ্ছাটা জাগিয়া উঠে ! ভাবিলাম, আর নহে, এইবারে চম্পট দেওয়াই ভাল । চতুর্ভুজকে বলিলাম, 'চল, যাই ।' সে বলিল, 'আরে না না, গানটা শেষ হতে দাও ।'

ছোট-বড় পার করেছি—
হাজার হাজার ;
জোর যার মুল্লুক তার,
এই নীতি সার !

ক্রমেই আমার শরীরটা কেমন যেন করিতে লাগিল । ভয়ে মুখ দিয়া একটিও কথা সরিল না । চতুর্ভুজের গা টিপিয়া ইসারা করিলাম, কিন্তু সে-স্থান ত্যাগ করিবার জন্য তাহার একটুও ব্যস্ততা দেখা গেল না ! এদিকে, তাহাকে চটাইয়া একা চলিয়া আসিতেও আমার সাহসে কুলাইল না !

জানোয়ারের টাগ-অভ-ওয়ার

কাকেও না ডরি মোরা,
মানুষ তো ছার ;
সারা জগৎ কেঁপে উঠে
ছাড়িলে হুঙ্কার !

হুঙ্কার না ছাড়িতেই আমার কাছে সারা জগৎ কাঁপিতেছিল, ছাড়িলে তো রক্ষাই ছিল না ! আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম । চতুর্ভুজ যদি আরো কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চিতই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িতাম । আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, এতক্ষণে তাহার সুমতি হইল—বাহির হইবার জন্য আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল । আমি তাহার হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া, তবে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম ।

আমার মুখের ভাব দেখিয়া এবার ঠাট্টার বদলে সে বরং সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল । আমরা কিছু দূর অগ্রসর হইলে পর, সে বলিল, 'সত্যি, তোমার ভয় পাবার কথাই বটে । কিন্তু উৎসবের দিনে,—বিশেষ রাজার সুমুখে কার সাধ্যি তোমাকে কিছু বলে ! তাই আমি অতটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম । সে যা হোক, উৎসব কেমন দেখলে, বল ?'

আমি বলিলাম, 'উৎসব বেশ দেখলাম । ক্রিকেট, ফুটবল, টাগ-অফ-ওয়ার—এ সব আমার খুবই ভাল লেগেছে ; কিন্তু ভাই, তোমাদের জাতীয় সঙ্গীত আমাকে একেবারে আধমরা করে ফেলেছিল ! আস্ত দেহ নিয়ে যে আজ ফিরতে পারব, সে আশা বড় ছিল না ! যা হোক, এখন যে প্রাণে প্রাণে বেঁচে এসেছি, সেই ঢের !'

আমরা চলিতে চলিতে আর একটা নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । সেখানে আসিয়াই চতুর্ভুজের মুখখানা কেমন যেন শুকাইয়া গেল ! তেমন স্ফূর্তি, তেমন দন্তবিকাশ আর নাই ! তাহার মুখের কথাও যেন ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল ! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এতক্ষণে তোমার সাহসেই আমি চলাফেরা করেছি,

এখন হঠাৎ তোমার কি হল ? তুমি এমন জড়সড় হয়ে পড়লে কেন ?' চতুর্ভুজ একটা গাছের উঁচু ডালের দিকে আঙুল বাড়াইয়া, ভয়ে ভয়ে বলিল, 'ঐ যে পেঁচা দেখছ, ওটাই আমার যম। তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ আলাপ !'

চতুর্ভুজের মুখের কথা না ফুরাতে, সেই পেঁচা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরিয়া ছুটিয়া আসিল এবং জালার মুখের মত প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া চতুর্ভুজকে গিলিয়া ফেলিল !

সেই বিদেশে হাজার হাজার জানোয়ারের মধ্যে আমার একমাত্র বন্ধুর এই দশা দেখিয়া, আমি বিশেষ ব্যথিত হইলাম। রাগে আমার গা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, পেঁচার মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলি ! আমি তাহাকে তাড়া করিলাম। সে ভয় পাইয়া নদীতে পড়িয়া গেল সেখানে একটা হাঁস ভাসিতেছিল ; সে পেঁচা তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। তাহাকে ধরিবার জন্য আমি ঝাঁপ দিবামাত্র একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইল, আর অমনি স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল।

এ কি ! কোথায় জানোয়ারের দেশ, আর কোথায় আমি ! জানোয়ারদের মেলা, তাহাদের ক্রিকেট, ফুটবল, টাগ-অফ-ওয়ার খেলা, তাহাদের জাতীয় সঙ্গীত, পেঁচার নিষ্ঠুরতা,—সবই আষাঢ়ে স্বপ্ন। আমি যেখানে যেভাবে শুইয়াছিলাম, তেমনিই আছি ! মাঝে থেকে, কেমন করিয়া কি যেন হইয়া গেল। আমি আশ্চর্য হইয়া আমার স্বপ্নের কথা ভাবিতে লাগিলাম ! তার পর কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, জানি না। সকালে উঠিয়া রাত্রের স্বপ্নের কথা যাহাকে বলি, সে-ই হাসিয়া মরে !

দ্বিতীয় স্বপ্ন
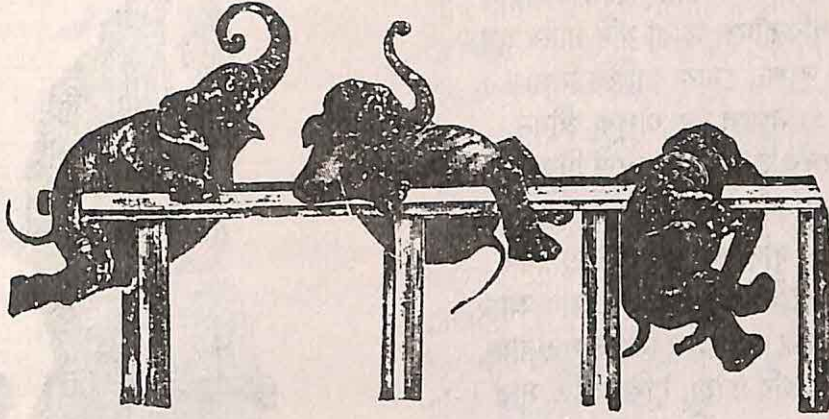
সন্ধির প্রস্তাব

সারাদিন কাটাইয়া শিকারের সুখে,
একদা ফিরিনু রাতে গৃহ অভিমুখে।
পরিশ্রান্ত দেহে যাই করিনু শয়ন,
অমনি হইনু গাঢ় ঘুমে অচেতন।
বহুক্ষণ পরে, নিশি নীরব নিঝুম,
হঠাৎ কি জানি কিসে ভেঙে গেল ঘুম।
দেখিলাম, নিরজন গভীর গহনে,
বসি, নিজে পশুরাজ পাত্র-মিত্র সনে।
করিছেন ব্যগ্রভাবে নানা আলাপন,
'কিসে অস্তর পরিত্যাগ করে নরগণ !'
ক্ষণ পরে পশুরাজ দাঁড়াইয়া খাড়া,
কহিলেন উচ্চ কণ্ঠে মাথা দিয়া নাড়া,
উভয় পক্ষের দোষ দেখিবারে পাই,
তারা অস্ত্র মারে, মোরা টুঁটি ছিঁড়ে খাই ;
কিন্তু মানুষের দোষ ক্ষমিবার নয়,
দূর হতে ছোঁড়ে অস্ত্র এত নীচাশয় !
থাকিত বীরত্ব যদি হত বলবান,
করিত সম্মুখ যুদ্ধ বীরের সমান।
দিতে পারি প্রতিশোধ, রাগে অঙ্গ দহে,
কিন্তু নব সভ্যতার রীতি তাহা নহে।
তাই আনিয়াছি সবে করি নিমন্ত্রণ,
যুক্তি কর কিসে অস্ত্র ত্যজে নরগণ।
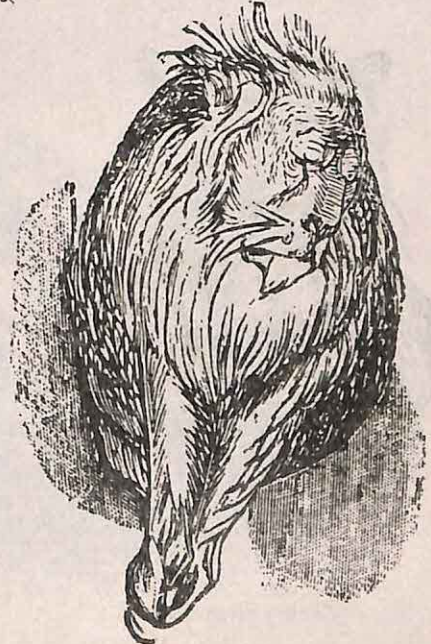
'গর্জন দংশন মোরা ছাড়িব নিশ্চয়'

আমার প্রস্তাব এই, পাঠাইয়া চর,
সর্বাগ্রে পরীক্ষা করি নরের অন্তর,
অস্ত্র পরিত্যাগে তারা যদি রাজি হয়,
গর্জন দংশন মোরা ছাড়িব নিশ্চয় ।
গ্রামে ও নগরে নর যাপুক জীবন,
আমাদের তরে শুধু ছেড়ে দিক বন ।
উঠিল দুরন্ত ব্যাঘ্র ঢুলু-ঢুলু আঁখি,
দুই হাত দুদিকের পকেটেতে রাখি
কহিল গম্ভীর স্বরে, 'যে প্রস্তাব আজ,
সভামাঝে করিলেন নিজে পশুরাজ,
সমর্থন করি তাহা, যুক্তি অতি সার ।
মানুষের সনে সন্ধি বড়ই দরকার ।
বক্তব্য করিয়া শেষ বসিলেন বীর ।

অমনি সজলনেত্রে কহিল কুমির,
'বড় সুখি হইলাম সুপ্রস্তাব শুনে,
দিবানিশি জ্বলিতেছি মনের আগুনে ।
শত অসহায় নরে করেছি ভক্ষণ,
বিবেক দংশনে তাই আসিছে ক্রন্দন ।

'বিবেক দংশনে তাই আসিছে ক্রন্দন'

উঠিল দুরন্ত ব্যাঘ্র ঢুলু আঁখি

কুমিরের নীতিকথা শুনিয়া নীরবে
মুখে হাত দিয়া হাসি থামাইল সবে !
তার পর হস্তীবর হাত উঁচু করি,
শুঁড়টি বাঁকায়ে ঠিক শিরোপরি ধরি,
কহিল গম্ভীরভাবে আশপাশে চাহি,
'মানুষের মত নীচ ত্রিভুবনে নাহি ।
রাজার উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু ভাইগণ,
বিশ্বাস করিতে নরে আছে কি কখন ?
সন্ধিতে স্বাক্ষর তার কতক্ষণ লাগে,
শর্ত কিন্তু ভাঙিবে সে সকলের আগে ।
ভাল মত জানি আমি মানবের রীতি,
মুখের বচনে তার অতিশয় প্রীতি,
অন্তরে বিদ্বেষ, সদা বিষবাণ হানে,
আপনার স্বার্থ ছাড়া কিছু নাহি জানে ।
যে যত কপট আর যত বেশী খল,
রাজনীতি ক্ষেত্রে সে ততই প্রবল ।
বুড়ো সুড়ো হইয়াছি, বুঝিয়াছি সার,
প্রবলের ক্রীতদাস নর কুলাঙ্গার !

সন্ধির প্রস্তাব রাখি, একেবারে ছুটি
পার যদি ধরিবারে সাপটিয়া টুঁটি,—
দেখিবে সে কাপুরুষ ঘৃণিত কেমন
পদতলে পড়ি ধূলি করিবে লেহন।'

না বসিতে হাতি, খাড়া হ'ল তিনজন,
চিতাবাঘ, নেকড়িয়া, ভালুক ভীষণ।
কহিল আবেগ ভরে, 'না করিব আর,
মানুষের প্রতি কভু কোন অত্যাচার।
প্রাণান্তে ছোঁব না কারো এক গাছা চুল,
তীক্ষ্ণধার দন্তগুলি সমূলে নির্মূল
করিব নোড়ার ঘায়ে ; এবে প্রাণ ভরি
রাজার প্রস্তাব মো'রা সমর্থন করি।'
ছুটিয়া আসিল সর্প, মাথা দিয়া নাড়া,
হাই তুলিবার ছলে দুটি বিষদাড়া
বাহির করিয়া কহে, সরোষে গর্জিয়া,
'আমাদর বংশ যাক নির্মুল হইয়া—
তবু সেই কুলাঙ্গার মানুষের সনে,
প্রাণান্তেও সন্ধিবদ্ধ হব না জীবনে।

'মানুষের মত নীচ ত্রিভুবনে নাহি'
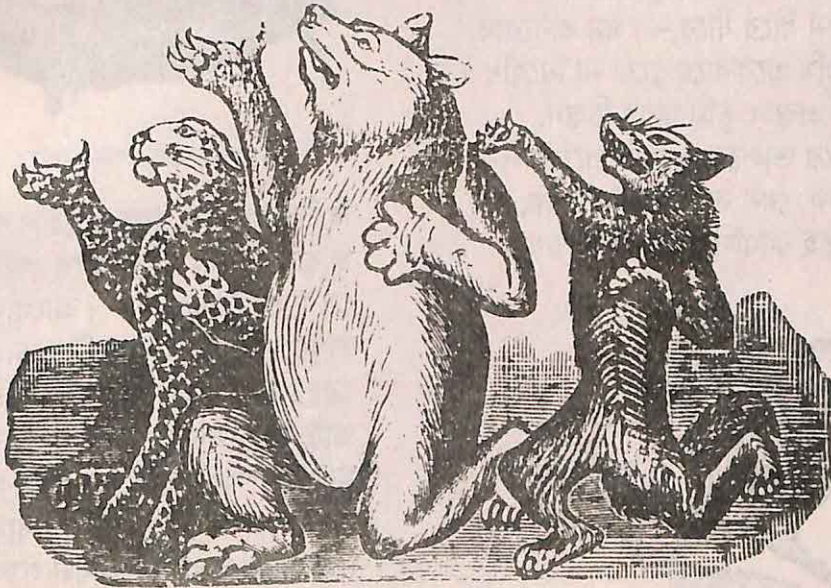
'না বসিতে হাতি, খাড়া হল তিন জন'

'প্রাণান্তেও সন্ধিবদ্ধ হব না জীবনে'

অধম পিশাচ সেই চিরশত্রু নরে,
ক্ষমা শুধু নিতান্তই জ্ঞানহীনে করে ;
পারিব না কভু তাহা । দোহাই রাজন্,
হেন অনুরোধ, প্রভু, করো না কখন ।'
শুনিয়া সর্পের কথা রাজা মহাশয়
দাঁড়াইয়া সভামাঝে, দুঃখে অতিশয়
কহিলেন ধীরে ধীরে,—'মম অনুরোধ,
সর্প, তুমি একেবারে হয়ো না নির্বোধ ।
আমার প্রস্তাব তুমি করহ চিন্তন,
মানুষেরে ভালবেসে নাহি প্রয়োজন ।
ভান কর, যেন ভালবাস অতিশয়,
তাহাতেই কার্যসিদ্ধি হইবে নিশ্চয় ।'

'দৌত্যকার্যে মোরে, প্রভু, করহ প্রেরণ'

শিয়াল উঠিল পরে ; বলে, 'ঠিক ঠিক
বজায় রাখিতে যদি চাহ সব দিক,
ছল, ভান, চালাকির অতি প্রয়োজন ।'
দৌত্যকার্যে মোরে, প্রভু, করহ প্রেরণ ।'
আদেশ দিলেন রাজা, ছুটিল শিয়াল ।
সবে ভাবে, চালিয়াছি অতি পাকা চাল,
এই চালে একেবারে হবে বাজি মাত !
আছিল মর্কট এক দীর্ঘে আধ হাত
শাখার উপরে ; বলে, 'শুধু যে সেয়ান
তোমরাই, মনেও তা দিও না কো স্থান !
তোমাদের চেয়ে নর ধূর্ত শতগুণ,
হিংসা, দ্বেষ, অত্যাচারে তেমনি নিপুণ ।
যা কিছু অভাব ছিল দন্ত আর নখে,
ঘুচিয়া গিয়াছে তাহা অস্ত্রের পরখে ।
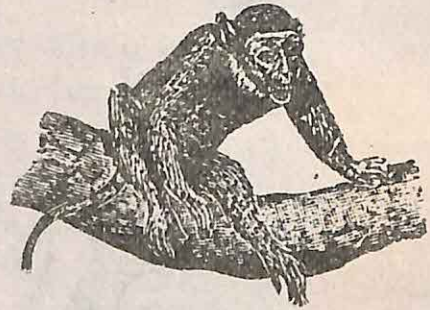
মানুষের কাছে নাহি খাটিবে চালাকি'

আঁটিছ মতলব, ছলে অস্ত্রহীন করে
আরামে নরের মাংস খাবে পেট ভরে,
সে সাধে পড়িবে বাদ ; আগে বলে রাখি,
মানুষের কাছে নাহি খাটিবে চালাকি !
ক্রোধ উপজিলে তার রক্ষা নাহি আর,
তাই বলি সোজা পথ দেখ যে যাহার !'
মর্কটের স্পর্ধা হেরি যত প্রাণিকুল
রাগে থর থর কাঁপে, চক্ষু জবাফুল !
এক সাথে হুঙ্কারিয়া করিল গর্জন,—
অমনি ভাঙিল মোর সাধের স্বপন !

প্রকাশক :
রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

দাম : ৬ টাকা

মুদ্রাকর :
ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২